International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 14 Issue 8 || August 2025 || PP. 226-232

অচিন্ত্যকুমারের ‘শাঙনের গান’: একটি শৈলীগত অনুধাবন

Achintyakumar's 'shrabon's Song is a Stylistic Pursuit'

DEBAPROSAD GOSWAMI
SACT -I, Dept. of Bengali
Katwa College

‘শব্দ তাঁর করায়ত্ত। শাণিত সায়কের মতো শব্দ ব্যবহার করতে পারেননি তিনি। তাঁর কবিসত্তা একদিকে তাঁকে সাহায্য করেছে। প্রসঙ্গত, কবি অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কেও উপযুক্ত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।’ (১)

মহাশ্বেতা দেবীর এই মন্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহিত্যে শব্দ ব্যবহার এবং সার্বিক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। এই আলোচনায় অগ্রসর হতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সময় ও যুগচেতনাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। সেই বিচারে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সময়কালকে আমাদেরকে বেছে নিতে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ‘শৈলী’ নামক এই বিশেষ মতবাদটির উদ্ভব হয় রাশিয়ায়। রুশ আঙ্গিকবাদীরা বলেন ‘শৈলী’ হল সাহিত্য বিচারের এক আধুনিকতম পদ্ধতি। আমরা দেখেছি আধুনিক বাংলা কবিতায় শৈলীর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেখানে তৈরি হয় নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। ধ্বনিস্তর থেকে আরম্ভ করে বাক্যস্তর পর্যন্ত তৈরি হয় নতুন এক আখ্যানের গল্প। শৈলীর আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে শব্দ। আর শব্দ ব্যবহার শৈলীর প্রাথমিক ধাপকে নিয়ন্ত্রণ করে বলা যায়। সেই নিরিখে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই কবিতার প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়েছে এখানে।

ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। আমাদের ব্যবহৃত ভাষা সে মুখের হোক বা লেখার, তার মধ্যে বিভিন্ন লক্ষণ ফুটে ওঠে। আর সেই লক্ষণগুলি ভাষা হওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে এই লক্ষণগুলিকে বলা হয় ভাষার ‘ব্যাকরণগত’ লক্ষণ। ব্যাকরণিক বিধিবদ্ধতায় বাক্য তৈরি হয়, কিন্তু সেই নিয়মের অদল-বদল ঘটলেও অনেক সময় বাক্যের অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু এই চিরাচরিত আদর্শ ব্যাকরণিক নিয়ম অনেক সময় না মেনেও বাক্য গঠন ও ব্যবহার করা হয়। ব্যাকরণের নিয়মে আমরা বাক্য ব্যবহার করি, কিন্তু সেই কথায় আমাদের মন কাড়ে না। সেখানে নজর কাড়ার জন্য আমাদের সাজানো গোছানো বাক্য ব্যবহার করতে হবে। অতএব ‘কী’ বলা হচ্ছে এবং ‘কেমন করে’ বলা হচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন বাক্যের শরীরে ও ভাবনায় সাধারণ অর্থ ছাড়াও ব্যঞ্জনা এবং নতুন চিন্তা-ভাবনা যোগ হয়ে যায়। তাকে ঠিক ‘সৌন্দর্য’ বলা যায় না। কারণ শুধু সৌন্দর্যের প্রেক্ষিতে ভাষার এই সাজগোজকে পুরোপুরি বেঁধে ফেলা যাবে না। ব্যাকরণের অনিবার্য নিয়মকে কখনও মেনে আবার কখনও তার সীমাবদ্ধতার বাইরে গিয়ে আমরা বাক্যের মধ্যে সেই ‘সাজগোজ’কে ব্যবহার করি। সেখানে অনেক রকম অদল-বদল বা হেরফের করার সুযোগ থাকে। এই তথাকথিত ব্যাকরণকে মানা বা সেই ব্যাকরণের বাইরে গিয়ে বৃহত্তর ব্যাকরণকে স্বীকার করা, শৈলীর বীজ তার মধ্যেই নিহিত।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ধারায় শৈলী নিয়ে আলোচনা অনেক দিন আগে থেকেই আমরা শুনে আসছি। প্রথমত শৈলীর দুটি দিকের কথা আমরা জানি। একটি হল ভাষাবিজ্ঞানের দিক, আর অন্যটি হল নন্দনতত্ত্বের দিক। সেখানে শৈলীবিষয়ক আলোচনা মূলত নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা। সাহিত্যের সব শাখাতেই এক অভিনব পদ্ধতি হল শৈলী দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা।

তাই কবিতা বিচারেও শৈলী নিয়ে আসে এক নতুন মুখ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে শৈলী নামক এই বিশেষ মতবাদটির উদ্ভব হয় রাশিয়ায়। তখন থেকেই রুশ আঙ্গিকবাদীরা বলতেন শৈলীবিজ্ঞান হল সাহিত্যতত্ত্ব বা ‘Poetics’ এর অংশ। কেউ কেউ ‘Style’ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে শৈলীকে ব্যবহার করেছেন। এই আলোচনা থেকে উপলব্ধি হয় ‘শৈলী’ হল সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণের এক নবতম বা আধুনিকতম পদ্ধতি। যা নৈর্ব্যক্তিক।

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে প্রথম 'Stylistics' এই পারিভাষিক শব্দটি পাওয়া যায়। এর পরে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 'Stilistik' এই পরিভাষাটি জার্মান ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত 'শৈলীবিজ্ঞান' এই পরিভাষাটির পাশাপাশি রয়েছে 'রীতিবিজ্ঞান' এই বিশেষ শব্দটি। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় 'Stylistik' শব্দটি সাহিত্য শৈলীর বিজ্ঞান অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

> 'The term 'Stylistik' has been in use the early 19th century and in English it is found as early as in 1846 (oxford English Dictionary) Stylistics as the art of forming good style in writing and as the science of literary style are a few of the meanings given in dictionaries.' (২)

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে থেকে মোটামুটি নিয়মিত ভাবে ইংরেজি ভাষায় 'Stylistics' শব্দটির প্রয়োগ শুরু হয়েছে। এখন যদি 'Style' এর কথায় আসি তাহলে দেখব লাতিন শব্দ 'Stilus' থেকে ইংরেজি শব্দ 'Style' এসেছে। Style শব্দের বাংলা তর্জমা করে অনেকেই 'রীতি' এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। বলা যায় রীতির একটা বিশেষ ক্ষেত্র বা এলাকা হল শৈলী। অর্থাৎ শৈলী হল সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি শাখা। এ সম্পর্কে Widdowson বলেন—

> 'Stylistics, then, is the study of the social function of language and is a branch of what has come to be called sociolinguistics.' (৩)

ভাষাবিজ্ঞানী জিয়োফ্রে এন. লীচ. (Geoffrey. N. Leech) এবং মাইকেল এইচ. শর্ট (Michael H Short) মনে করেন—

> "In this most general Interpretation, the word 'STYLE' has a fairly uncontroversial meaning; it refers to the way in which language is used in a given context, by a given person, for a given purpose, and so on." (৪)

এক কবিত্বময় ভাব ও ভাবুকতা নিয়ে অচিন্ত্যকুমারের জীবনবোধের পথচলা শুরু বলা যায়। প্রথমদিকে তাঁর কবিতা রচনায় হামসুনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পথিক বৃত্তির নেশা যেদিন থেকে তাঁকে আচ্ছন্ন করল, সেদিন থেকেই মনের বন্ধন ছিন্ন হল তাঁর। কেউ কেউ অসতর্ক ভাবে তাঁকে বলেছেন 'পথের কবি'। তাঁর কাব্যভাষায় আছে কাব্যিক চেতনার রঙ। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সবুজ মিছিলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যেন এক বলিষ্ঠ শক্তি। কল্লোলেই তাঁর আত্মপ্রকাশ; কল্লোলেই তাঁর বেড়ে ওঠা। এইসময় তিনি দুহাত ভরে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্যের অস্তিত্ব রক্ষার নামে বিরোধীরা শোরগোল তুলেছেন অনেক। উপহার হিসেবে পেয়েছেন নিন্দার বিষ। উল্টোদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে মিলেছে নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই। তবু তিনি থেমে থাকেননি। 'কল্লোলে'র স্রোতে নিত্য অবগাহন করে নতুন নতুন চমক নিয়ে জ্বলে উঠেছেন বারে বারে। তাই বলা যায় তিনি কল্লোলকে দিয়েছেন ঘনিষ্ঠ প্রাণ ও লেখনী, আর কল্লোল তাঁকে দিয়েছে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সম্মান।

কবির মনোজগতে বাইরের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে তা হল প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে কবি সাহিত্যিকদের কাছে প্রকৃতির একটি অন্যতম আবেদন রয়েছে। কবির মন প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গে জারিত হয়। সেই জারণের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। আর সাহিত্যের প্রাচীন সংরূপের মধ্যে কবিতা নামক সংরূপে সেই প্রতিফলন আরো গভীরভাবে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ের সূত্র ধরে বলা যায়, প্রকৃতি কখনো কবির কাছে হয়ে ওঠে প্রেয়সী, আবার কখনো জননী, আবার কখনও কখনও সে সীমা অসীমের মিলন সাধকের রূপক। আবার কখনো সে দেখা দেয় সতী রূপে, হয়ে ওঠে দ্বিতীয় সত্তা। এছাড়াও প্রকৃতির রুদ্র, প্রচন্ড মূর্তিও কবির চোখে ধরা দেয়। বাংলা গীতিকাব্যের 'ভোরের পাখি' বলে যিনি পরিচিত, সেই বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রকৃতিকে সত্তা রূপে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—

'নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল-হিল্লোল ধারা,
বিচিত্র-বিচ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব-নিস্তব্ধ সব
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।'(৫)

আবার রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিকে নব নব রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন তার বিরাট কবিসত্তার অঙ্গনে। সেখানে প্রকৃতি কখনো জীবন, কখনো মৃত্যু, কখনো ঈশ্বর, কখনো সুন্দর, কখনো ধ্বংসের প্রতীক, কখনো নির্মাণের নতুন দ্যুতি, কখনো খন্ডতার প্রতীক, কখনো অখন্ডের মিলন সাধনায় ব্যস্ত, কখনো 'নির্ঝর', আবার কখনো অসীমের ডাক হয়ে উঠেছে। তাই তিনি বলেছেন—

'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরসা-
কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।(৬)

এখানে প্রকৃতির বর্ষা ঋতুর চিত্র এবং কবির মনোজগতে পল্লী গ্রামের বর্ষার পরিবেশ কতটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, তার বর্ণনা আমরা পেয়ে যাই। আবার পরবর্তীতে তাঁর ঘোষণা—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।(৭)

এখানে প্রকৃতি সীমা-অসীমের মিলন সাধকের রূপক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থাৎ তথাকথিত রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কবিতায় প্রকৃতির চিত্র বদলে যেতে শুরু করল। কারণ এই সময়ের কবিরা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রানুসারী পথ পরিহার করে স্বতন্ত্র ভাবধারায় নিজেদেরকে তথা নিজেদের স্বতন্ত্র ভাবনাকে কবিতায় নতুনভাবে তুলে ধরতে। এছাড়াও সমাজ এবং পরিবেশে বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ফলশ্রুতি প্রকৃতির স্থিতাবস্থাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রপরবর্তী একজন আধুনিক কবির মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

> 'নতুন সময়ের জন্য নতুন ও নতুন ভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্য, নতুন চেতনা ও ভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনার যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে, একালের কোন কোন কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকের বাংলা কবিতা স্বভাবতই বিষয় ও রীতি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষার একটা অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।' (৮)

এভাবে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের কাছে মনোবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের জটিল অংক যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করল, তার আবর্তে কবিরা পেল নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। বাস্তবতাকে রূপ দিতে গিয়ে প্রকৃতি কখনো সতী, কখনো সত্তা এই ধারণা থেকে অনেক দূরে সরে সরে চলে গেলেন সেই সময়ের কবিরা। তাঁদের কাছে প্রকৃতি হয়ে উঠল ক্ষয়িষ্ণু জনজীবনের প্রতীক।

প্রকৃতির কোমল সত্তায় হাত সেঁকছিলেন যে কয়েকজন বাঙালি কবি তাঁদের সাহিত্যে প্রকৃতি প্রকাশ পেল অন্যরূপে, অন্য ভাবনায়। প্রকৃতি চেতনায় মিশে গেল ইতিহাস চেতনা। একজন আধুনিক কবি তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বাস্তব চেহারাকে যে আবেদন নিয়ে প্রকাশ করলেন তা নিম্নরূপ—

'চুল তার, কবেকার, অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;'(৯)

এখানে প্রকৃতিচেতনা ইতিহাস চেতনার সঙ্গে মিশে নতুন এক বোধ তৈরির চেষ্টায় আকুলায়িত। জটিল পৃথিবীর ঘূর্ণাবর্তে প্রকৃতির এই নব নব রূপ, ধারণ করে আছে চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা। এই সময়কে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদেরকে পৌঁছাতে হয় 'কল্লোল' যুগে। যেখানে আধুনিক বাংলা কবিতার নব নব জয়যাত্রার কথা ঘোষিত হয়েছে বারে বারে। এ বিষয়ে এক কবি তথা সাহিত্য সমালোচক আমাদের জানাচ্ছেন—

> 'মোটামুটি রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে কবিতা লিখে গেলেও নতুন ভাষার তাৎপর্য আনবার যে একটা উদ্যোগ চলছিল 'কল্লোল'-এর তার মূল্য স্বীকার করতে হবে, এবং কয়েকটি কবিতা অন্ততঃ সার্থক হয়েছিল;' [১০]

এভাবেই কল্লোলে'র একজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতায় প্রকৃতিভাবনা যুগলক্ষণ অনুযায়ী নানা মাত্রায়, নানা স্বাদে, নানা আঙ্গিকে ফুটে উঠল। এর সঙ্গে যুক্ত হল আধুনিক বিচার বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতি শৈলীভাবনা। যেখানে কবিতায় শব্দ ব্যবহার, ভাষানির্মিতি, অন্বয়ের বিচ্যুতি সাধারণ অর্থকে ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় বাস্তবতার মুখোমুখি এক অন্য অর্থে। সেই অর্থেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'শাঙনের গান' কবিতায় প্রকৃতিভাবনা ধরা দিয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। কবিতাটির পারিভাষিক অর্থ 'শ্রাবণের নদী'। এই কবিতায় প্রকৃতি ও প্রেম হাত ধরাধরি করে একাত্ম হয়ে উঠেছে। সরলকলাবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কবিতায় মধ্যম লয় পাঠককে পৌঁছে দেয় এমন এক খোলা আকাশের নিচে, যেখানে শ্রাবণের জলধারা হৃদয়ের বর্ষণমঙ্গলকে ফুটিয়ে তোলে। কবি একসাথে বলেছেন 'ময়ূরের মত পেখম মেলেছে, দেখিয়া উতলা হনু'- এই বাক্যে ঘটেছে অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে প্রেয়সীকে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। 'দেখিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়া টেনে এনেছে, 'হনু' উত্তম পুরুষের এই তৎসম শব্দের পাশে ব্যবহৃত হওয়া সমাপিকা ক্রিয়াপদকে। অন্বয়ের এই জটিল বিন্যাসে কবিতার প্রকৃতিভাবনা আরও জটিল অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আবার একস্থানে কবি বলেছেন, 'রজনী ভরিয়া তারার আলোয় খুঁজিছো কি বন্ধুরে?'— এই পংক্তিতে একটা অন্ধকার স্পষ্ট। কবি সেই অন্ধকারে নিমজ্জিত আছেন এটাও স্পষ্ট। এবং সেখান থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছেন সে কথার ইঙ্গিত আছে। 'তারার আলোয় খুঁজিছো কি?' এই শব্দগুলি এমন বিন্যাসে রচিত হয়েছে যেখানে প্রশ্ন-উত্তরের ভাব যেমন প্রকাশিত হয়েছে, পাশাপাশি রাত্রির অন্ধকারে তারার আলোয় ক্ষীণ পলকে নিজের প্রেয়সীকে খুঁজে পাবার একটা বাসনা তৈরি হয়েছে। কারণ কাব্যের নাম 'অমাবস্যা', এই শব্দনির্বাচন অন্ধকারকে স্পষ্ট করে এবং ঋতু পরিবর্তনের প্রকৃতিতে, তা প্রেমের গায়ের সেটে দেয় বিষাদের ভাবনা।

এই কাব্যের কবিতাগুলিতে অন্ধকার প্রকৃতির কোলে প্রেয়সীর অবস্থান নিয়ে কবি চিন্তিত। কারণ প্রকৃতি এখানে হয়ে উঠেছে মানবমুখী। অন্য একটি কবিতায় তিনি বলেছেন 'সন্ধ্যার ওই সন্ধাভাষায় মোরে তুমি ডাকিলে কি?' প্রশ্নবোধক এই বাক্যে প্রথমত দেখা যাচ্ছে অনুপ্রাসের একটা লঘু প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আলো-আঁধারি ভাষার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। প্রকৃতির এই দ্বর্থ্যবোধক ভাষাকে তিনি 'সন্ধাভাষা' নামে প্রয়োগ করে বোঝালেন যে, এই ভাষার ধর্ম হল কিছুটা বোঝা এবং অনেক কিছু না বোঝা। এভাবে প্রকৃতি ও প্রেয়সী এই দুই প্রেক্ষিতকে উপলব্ধি করার জন্য কবি নিজে জানাচ্ছেন—

> 'অন্তরের গোপন মহারহস্য আবিষ্কার করতে হলে মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় সমুদ্রের তীরে কিংবা খোলা আকাশের নীচে।' [১১]

এভাবে অচিন্ত্যকুমারের বিভিন্ন কবিতায় শৈলীবিচারের মাধ্যমে দেখতে পাই, তাঁর কবিসত্তার প্রশান্তি ঘটেছে প্রকৃতির অসীমতার কাছে। সেখানে তাঁর গন্তব্যস্থল হলো খোলা দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ এবং অফুরান মহাসাগরের তীর। এই কবিতার একেবারে শেষ অংশে কবি ঘোষণা করেছেন, 'বিস্মরণের তীর হতে তবু তোমারেই শুধু দেখি'-এত বিচ্ছেদ, এত সংকট, এত ভাঙা-গড়া এই অবস্থার বর্ণনা এখানে 'তবু' অব্যয়ের মাধ্যমে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সামাজিক সংকটের দিনে প্রেয়সীকে কবি খুঁজে পেয়েছেন বিস্মরণের তীরে। আশাবাদ ধ্বনিতে হয়েছে কবিতার এই পংক্তিতে। এ প্রসঙ্গে একজন আধুনিক সমালোচক রনজিৎ পান বলেছেন—

> 'প্রকৃতি ও প্রেম অচিন্ত্যকুমারের কবিতায় কোথাও কোথাও একাত্ম হয়ে উঠেছে।' [১২]

প্রত্যেক শিল্পীকেই নিসর্গ জগতে বিচরণ করতে হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও এর বাইরে নন। তিনিও এক বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে বিচরণ করেছেন। সেই বিচরণের মাপকাঠিতে 'অমাবস্যা' কাব্যগ্রন্থের 'সংকেতময়ী' কবিতাটির কথা বলা যেতে পারে। নামকরণ থেকে আমরা ইঙ্গিত পাই তিনি প্রকৃতিকে এক স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে দেখেছেন। প্রকৃতিপ্রেমী কবিরা প্রকৃতির অচেতন ধর্মের উপরে আরোপ করেন চেতন ধর্মের নানান লক্ষণ। তাই প্রকৃতি এই কবিতায় মূক হয়ে থাকেনি। এক স্থানে কবি বলেছেন—

'দুহাত বাড়ায়ে আকাশ চেয়েছি, চেয়েছি বসুন্ধরা
একদা চমকি চাহিয়া দেখিব, তুমি এসে দেছ ধরা।'

প্রথম পংক্তির বাক্য গঠনের Style দু'প্রকার। প্রথমভাগে বাংলা বাক্যের সাধারণ গঠনধর্ম তথা আন্বয়িক ক্রম বজায় আছে, কিন্তু দ্বিতীয়ভাগে 'চেয়েছি বসুন্ধরা' এই ক্রম তথা গঠনধর্ম বিচ্যুত হয়েছে। অন্বয়ের এই বিচ্যুতি কবিতায় এনেছে একটা অন্যরকম গতিশীলতা। এইসব গঠন দ্বিতীয় পঙক্তির দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ 'তুমি এসে দেছ ধরা' এখানে ঘটেছে। 'দেছ' এই তথ্য একাধিক তৎসম শব্দের পাশে বসে কবিতার শব্দ ব্যবহার তথা নির্বাচনের রীতিতে ঘটেছে পরিবর্তন। আমরা দেখলাম আকাশ এবং বসুন্ধরা প্রকৃতির এই বৃহৎ প্রেক্ষিতে কবি প্রকাশ করলেন প্রেমের উষ্ণতাকে। প্রকৃতির এই দুই প্রধান চিত্রকল্প ব্যতীত এ কবিতার প্রেমভাবনা নিরর্থক হয়ে যায়। আকাশের রূপকে, প্রেয়সীকে কল্পনা হয়তো নতুন নয়, কিন্তু ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতার আঙ্গিকে এই ভাবনা অভিনব। দ্বিতীয় পঙক্তির দ্বিতীয় ভাগের বাক্য গঠনে যে ভাবনা নিয়ে আসে সেখানে কবিপ্রিয়া কবির কাছে নেই। কবিতার অন্তরে একটা বিরহভাব প্রকটিত হয়। বিরহের তীব্রতার অবসান ঘটে প্রকৃতির কোলে অবস্থান করে। সেখানে 'দিছ' ক্রিয়াপদটি এই কবিতার ভাবনাকে নতুনরূপে প্রকাশ করে।

এই কবিতার একটি পংক্তিতে কবি বলেছেন 'প্রার্থনা করি, হয়ো না আবিষ্কৃত'—এই বাক্যে কবি প্রথমত আন্বয়িক গঠনের বিচ্যুতি ঘটালেন। এর মাধ্যমে একটা কোমলতার ভাব কবিতার মধ্যে জেগে উঠেছে। আমরা দেখেছি কবিরা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে চেষ্টা চালিয়েছেন বারবার। কিন্তু এখানে কবি প্রকৃতিকে 'সংকেতময়ী' এই শব্দবন্ধে প্রকাশ করে তথা প্রকৃতিকে এক নতুন সম্বোধনে আমাদের কাছে হাজির করলেন। আমরা মুখোমুখি হলাম নতুন তত্ত্বের। সেই তত্ত্বের রহস্য উন্মোচনে নয়, রহস্য গোপনেতেই আনন্দ প্রাপ্তি উপলব্ধি করেছেন কবি। তিনি রহস্যের উন্মোচন চান না, এবং তার জন্য রয়েছে আকুল প্রার্থনা। এই বোধ ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতার চেনা পথে একটা মাইলস্টোন হিসবে চিহ্নিত হয়ে যায়। জ্ঞাপনের নতুন তত্ত্বকে হাজির করে। এর পরের পংক্তিতে কবি ব্যবহার করলেন 'তোমার মাঝারে যেন অনুভবি—জীবন অপরিমিত' এই বাক্যবন্ধ। এই বাক্যে দুটি অংশ। প্রথম অংশে 'তোমার মাঝারে যেন অনুভবি' এই বাক্যাংশে ব্যবহৃত 'মাঝারে' শব্দটির নির্বাচন বাক্যটির ভাব এবং রূপকে বদলে দিয়েছে। এছাড়াও বাক্যটি শেষ হয়েছে একটি ক্রিয়াবিশেষণ দিয়ে সেটি হল 'অনুভবি'। এই বিশেষ শব্দ নির্বাচন পাঠককে অনুভব করায় প্রকৃতির অপার রহস্যময়তাকে। এরপর একটি দীর্ঘ হাইফেন ব্যবহার, পাঠককে থামিয়ে দেয় কিছু সময়ের জন্য। যেন নান্দনিক রিলিফ, যা আমাদের ভাবনাকে পৌঁছে দেয় এক গভীর সংকেতের দিকে, যেখানে প্রকৃতির গূঢ় হাতছানি অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। কবি এই উন্মোচন চান না। তিনি চান রহস্য চিরকাল কবির কাছে গোপন থাক। কবির কাছে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে আসুক প্রকৃতি। কারণ তার বিস্তার অনন্ত। তাই এই পঙক্তির দ্বিতীয় অংশে ওই দীর্ঘ হাইফেনের পর বলতে হয় 'জীবন অপরিমিত'। এখানে জীবনের রূপকে প্রকৃতি ধরা দিয়েছে। রূপক অলংকারের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে সে হয়ে ওঠে অপরিমিত। যেখানে কবি চাইছেন প্রকৃতির কোলে প্রেয়সীকে নতুন নতুন রূপে সাজিয়ে তুলতে। এ কবিতার কতগুলি শব্দ নির্বাচন সেই ভাবনাকে স্পষ্ট করে। 'উষার ভূষণ', 'চঞ্চল মর্মর', 'অগাধ স্বাদ', 'সাগর সাশ্রু চোখে' এই শব্দগুলি কবিতায় প্রকৃতি ভাবনাকে আরো ব্যঞ্জনাবহ করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, 'তাঁর লেখা', 'কথাসাহিত্য পত্রিকা', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, কোল- ০৯, মুদ্রণ- মাঘ ১৪১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২১

২. N., Krishnaswami, Verma, S.K., Nagarajan, M., 'Modern Applied Linguistics', Macmillan, madras, 1992, Page no- 79

৩. Widdowson, H. G. 'An approach to stylistic analysis', In JPB Allen & Sp Corder, 1974, Page No- 202

৪. Leech, Geoffrey, N. @ Short, Michael, H., 'Style in Fiction', Longman, London, 1981, Page No- 18।

৫. আচার্য, দেবেশকুমার (সম্পাদনা), 'বিহারীলালের সারদামঙ্গল', সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-০৯, মুদ্রণ-১০ই জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-০৩

৬. সঞ্চিতা, কামিনী সংস্করণ, কলকাতা-০৯, মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩

৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৪

৮. দাশ, অশোক, 'অসমাপ্ত আলোচনা', 'কবিতার কথা', নিউক্রিপ্ট, কলকাতা-০৭, মুদ্রণ-২০২১ আগস্ট, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১২

৯. চট্টোপাধ্যায়, শিবব্রত (সম্পাদনা), 'বনলতা সেন', এ কালের কবিতা, রাজবাটি, বর্ধমান- ৭১৩১০৪, মুদ্রণ- আগস্ট ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫

১০. দাশ, জীবনানন্দ, 'অসমাপ্ত আলোচনা', 'কবিতার কথা', তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১০

১১. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'দিগন্ত', এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা-০৯, মুদ্রণ-১৯৫৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৪

১২. পান, রনজিৎ, 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাব্য'। 'কল্লোল যুগ ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত' অর্পিতা প্রকাশনা, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোল-১২, মুদ্রণ- ২০২৩, পৃষ্ঠা-৬৬

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আইয়ুব, আবু সঈদ, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট-২০০৯

২. আইয়ুব, আবু সঈদ ও মুখোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা), 'আধুনিক বাংলা কবিতার ভূমিকা', কবিতা ভবন, কলকাতা, ১৩৪৬

৩. চক্রবর্তী, উদয়কুমার, আধুনিক কবি কবিতার শৈলী, ইন্দাস, কলকাতা, ২০০৫

৪. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, 'কবিতার কী ও কেন', দে'জ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৬

৫. চক্রবর্তী, বিপ্লব, (সম্পাদনা), 'শৈলী চিন্তাচর্চা', রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০৩

৬. চক্রবর্তী, বিপ্লব, 'লোকাভরণ আধুনিক কবিতার শৈলী', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬

৭. চক্রবর্তী, বিপ্লব, 'একালের কবিতা শৈলীসন্ধান', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০৮

৮. চক্রবর্তী, শ্যামাপদ, 'অলংকার চন্দ্রিকা', বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ২০০৪

৯. চক্রবর্তী, সুদীপ্তা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: কবি ও কথাশিল্পী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা বৈশাখ- ১৪২০

১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ', দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭

১১. মিত্র, হরপ্রসাদ ও চক্রবর্তী নিরঞ্জন, 'অচিন্ত্যকুমারের সমগ্র কবিতা', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ১৩৮১ আষাঢ়

১২. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, দেজ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কোল-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮

১৩. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'অমাবস্যা', ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৯

১৪. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'আমরা', ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩২ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'কল্লোল যুগ', এম সি সরকার, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ - ১৪২১